তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

সপ্তবিংশতি

বিদ্যাসাগর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীআশুতোষ ধর

আশুতোষ লাইব্রেরী

৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯২৬

তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

সপ্তবিংশতি

বিদ্যাসাগর

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ ধর
আশুতোষ লাইব্রেরী
৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৯২৬

B. L. No 31
1 Apr. 1927
18/8/28

প্রকাশককর্ত্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

IMPERIAL LIBRARY

ঢাকা,
আশুতোষ প্রেসে
শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম সহস্র

বিদ্যাসাগর।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম—বংশপরিচয়—শৈশব ও শিক্ষা অধ্যবসায়।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয়। আজ কত বৎসর হইল তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তথাপি তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতিছবি বাঙ্গালীর হৃদয়মুকুর হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার নাম, তাঁহার পুণ্যজীবনকথা প্রত্যেক বাঙ্গালী গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে সন ১২২৭ (ইংরাজী ১৮২০ খৃঃ অঃ) ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা

দ্বিপ্রহরের সময় ঈশ্বরচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস অত্যন্ত দরিদ্র কিন্তু নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় - বড়বাজারে জগদ্দুর্লভসিংহের বাটীতে মাসিক দুইটাকা বেতনে বিল সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। ঠাকুরদাস অল্পকাল মধ্যেই আপনার কার্য্যদক্ষতাগুণে যে সময়ে দশটাকা করিয়া প্রতিমাসে বেতন পাইতেছিলেন সেই সময়ে বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়। পরিচয় সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং যাহা লিখিয়াছেন এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

"প্রপিতামহাদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান— জ্যেষ্ঠ নৃসিংহরাম, মধ্যম গঙ্গাধর, তৃতীয় রামজয়, চতুর্থ পঞ্চানন, পঞ্চম রামচরণ। তৃতীয় রামজয় তর্কভূষণ আমার পিতামহ। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহত্যাগের পর জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সংসারে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে তাঁহাদের সহিত রামজয় তর্কভূষণের কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া এককালে দেশত্যাগী হইলেন।"

"বীরসিংহ গ্রামে উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক অতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ এই উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের তৃতীয়া কন্যা দুর্গাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দুর্গাদেবীর গর্ভে তর্কভূষণ মহাশয়ের দুই পুত্র ও চারি কন্যা

জন্মে। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস, কনিষ্ঠ কালিদাস; জ্যেষ্ঠা মঙ্গলা, মধ্যমা কমলা, তৃতীয়া গোবিন্দমণি, চতুর্থী অন্নপূর্ণা। জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমার জনক।"

"রামজয় তর্কভূষণ দেশত্যাগী হইলে, দুর্গাদেবী পুত্রকন্যা লইয়া বনমালিপুরের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দুর্গাদেবীর লাঞ্ছনা ভোগ ও তদীয় পুত্রকন্যাদের উপর কর্ত্তৃপক্ষের অযত্ন ও অনাদর এতদূর পর্য্যন্ত হইয়া উঠিল যে, দুর্গাদেবীকে, পুত্রদ্বয় ও কন্যা চতুষ্টয় লইয়া, পিত্রালয়ে যাইতে হইল। কতিপয় দিবস অতি সমাদরে অতিবাহিত হইল। দুর্গাদেবীর পিতা তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয় অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন; এজন্য সংসারের কর্ত্তৃত্ব তদীয় পুত্র রামসুন্দর বিদ্যাভুষণের হস্তে ছিল।"

"কিছুদিনের মধ্যেই পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয়ে কাল যাপন করা দুর্গাদেবীর পক্ষে বিলক্ষণ অসুখের কারণ হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃভার্য্যা তাঁহার উপর অতিশয় বিরূপ। অবশেষে দুর্গা-দেবীকে, পুত্রকন্যা লইয়া পিত্রালয় হইতে বহির্গত হইতে হইল। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বাটীর অনতিদূরে, এক কুটীর নির্ম্মিত করিয়া দিলেন। দুর্গাদেবী, পুত্রকন্যা লইয়া সেই কুটীরে অবস্থিতি ও অতি-কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।"

"ঐ সময়ে টেকুয়া ও চরকায় সূতা কাটিয়া, সেই সূতা বেচিয়া, অনেক নিঃসহায় নিরুপায় স্ত্রীলোক আপনাদের দিন গুজরান করিতেন। দুর্গাদেবী সেই বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। * * * * * তাদৃশ স্বল্প আয়দ্বারা নিজের, দুইপুত্রের ও চারিকন্যার ভরণপোষণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহার পিতা সময়ে সময়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন; তথাপি তাঁহাদের আহারাদি সর্ব্ববিষয়ে ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। এই সময়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম ১৪।১৫ বৎসর। তিনি মাতৃদেবীর অনুমতি লইয়া, উপার্জ্জনের চেষ্টায়, কলিকাতা প্রস্থান করিলেন।"

"সভারাম বাচস্পতি নামে আমাদের এক সন্নিহিত জ্ঞাতি কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার, সুপ্রসিদ্ধ চতুর্ভুজ ন্যায়রত্নের নিকট অধ্যয়ন করেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে ও সহায়তায়, কলিকাতায় বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হয়েন। ঠাকুরদাস এই সন্নিহিত জ্ঞাতির আবাসে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন এবং কি জন্য আসিয়াছেন অশ্রুপূর্ণলোচনে তাহা ব্যক্ত করিয়া, আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সময় ভাল, অকাতরে অন্নব্যয় করিতেন; এমন স্থলে, দুর্দ্দশাপন্ন জ্ঞাতি সন্তানকে অন্ন দেওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। তিনি, অতিশয়

দয়া ও সবিশেষ সৌজন্যপ্রদর্শনপূর্ব্বক, ঠাকুরদাসকে আশ্রয় প্রদান করিলেন।”

“ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে সন্ধ্যার পরেই উপরি লোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। ঠাকুরদাস ইংরাজী পড়ার অনুরোধে, সে সময়ে উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; যখন আসিতেন, তখন আর আহার পাইবার সম্ভাবনা থাকিত না; সুতরাং তাঁহাকে রাত্রিতে অনাহারে থাকিতে হইত। এইরূপে নক্তন্তন আহারে বঞ্চিত হইয়া, তিনি দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতেছ কেন? তিনি কি কারণে তাঁহার সেরূপ অবস্থা ঘটিতেছে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার পরিচয় দিলেন। ঐ সময়ে সেই স্থানে শিক্ষকের আত্মীয় শূদ্রজাতীয় এক দয়ালু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং ঠাকুরদাসকে বলিলেন, “যেরূপ শুনিলাম তাহাতে আর তোমার ওরূপ স্থানে থাকা কোন মতেই চলিতেছে না। তুমি যদি রাঁধিয়া খাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমায় আমার বাসায় রাখিতে পারি। এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া ঠাকুরদাস, যারপর নাই, আহ্লাদিত হইলেন এবং পরদিন অবধি, তাঁহার বাসায় গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ঠাকুরদাসের দুর্ভাগ্যক্রমে

তদীয় আশ্রয়দাতার আয় বিলক্ষণ খর্ব্ব হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহার নিজের ও তাঁহার আশ্রিত ঠাকুরদাসের অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বহির্গত হইতেন এবং কিছু হস্তগত হইলে, কোনও দিন দেড় প্রহরের, কোন দিন দুই প্রহরের, কোন দিন বা আড়াই প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন। যাহা আনিতেন তাহা দ্বারা কোনও দিন বা কষ্টে, কোনও দিন বা স্বচ্ছন্দে নিজের ও ঠাকুরদাসের আহার সম্পন্ন হইত। কোনও কোনও দিন তিনি দিবাভাগে বাসায় আসিতেন না। সেই সেই দিন ঠাকুরদাসকে সমস্ত দিন উপবাসী থাকিতে হইত।"

"একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ক্ষুধায় অস্থির হইয়া, ঠাকুরদাস বাসা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অন্যমনস্ক হইয়া, ক্ষুধার যাতনা ভুলিবার অভিপ্রায়ে, পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, তিনি অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল পাইলেন। ক্ষুধার যাতনা ভুলিয়া যাওয়া দূরে থাকুক, বড়বাজার হইতে ঠন্‌ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এত ক্লান্ত ও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় এত অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই, তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি মুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া

ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা ঠাকুর, দাঁড়াইয়া আছ কেন ?" ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি সাদরে ও সস্নেহবাক্যে ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয় বিবেচনা করিয়া কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস যেরূপ ব্যগ্র হইয়া মুড়কিগুলি খাইলেন, তাহাই এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই। তিনি বলিলেন, না মা আজ আমি এখন পর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাবাঠাকুর জল খাইও না, একটু অপেক্ষা কর এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে সত্বর দই কিনিয়া আনিলেন এবং আরও মুড়কি দিয়া ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন, পরে, তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া জিদ করিয়া বলিয়া দিলেন যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে। যে যে দিন দিবাভাগে আহারের যোগাড় না হইত, ঠাকুরদাস সেই সেই দিন, ঐ দয়াময়ীর আশ্বাসবাক্য অনুসারে তাঁহার দোকানে গিয়া পেট ভরিয়া ফলার করিয়া আসিতেন।"

"কিছুদিন পরে ঠাকুরদাস আশ্রয়দাতার সহায়তায়, মাসিক দুই টাকা বেতনে কোনও স্থানে নিযুক্ত রহিলেন।

এই কর্ম্ম পাইয়া তাঁহার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও যারপর নাই পরিশ্রমী ছিলেন এবং কখন কোনও ওজর না করিয়া সকল কর্ম্মই সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন, এজন্য ঠাকুরদাস যখন যাঁহার নিকট কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন।”

“বড়বাজারের দয়েহাটায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ভাগবতচরণ সিংহ নামে এক সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তির সহিত তর্কভূষণ মহাশয়ের বিলক্ষণ পরিচয় ছিল। সিংহ মহাশয় অতিশয় দয়াশীল ও সদাশয় মনুষ্য ছিলেন; তর্কভূষণ মহাশয়ের মুখে তদীয় দেশত্যাগ অবধি যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রস্তাব করিলেন, আপনি অতঃপর ঠাকুরদাসকে আমার বাটীতে রাখুন আমি তাহার আহার প্রভৃতির ভার লইতেছি; সে যখন স্বয়ং পাক করিয়া খাইতে পারে, তখন আর তাহার কোন অংশে অসুবিধা ঘটিবেক না। এই অবধি ঠাকুরদাসের আহারের ক্লেশের অবসান হইল। যথাসময়ে আবশ্যকমত দুইবেলা আহার পাইয়া তিনি পূর্ণজন্ম জ্ঞান করিলেন। এই শুভ ঘটনার দ্বারা তাঁহার যে কেবল আহারের ক্লেশ দূর হইল, এরূপ নহে; সিংহ মহাশয়ের সহায়তায় মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে একস্থানে নিযুক্ত হইলেন।”

"এই সময়ে ঠাকুরদাসের বয়ঃক্রম তেইশ চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তর্কভূষণ মহাশয়, গোঘাট নিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয় কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এই ভগবতী দেবীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভগবতী দেবী শৈশবকালে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।"

পাঁচ বৎসর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। সেকালে গ্রাম্য পাঠশালাতে বালকদিগের প্রাথমিক বিদ্যারম্ভ হইত। এই সময় তাঁহার হস্তাক্ষর বড় সুন্দর হইয়াছিল। তখন হস্তাক্ষরই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত, হস্তাক্ষরই বিবাহের সর্ব্বোচ্চ সুপারিস্। গুরু কালীকান্ত বালক বিদ্যাসাগরের বুদ্ধিমত্তা ও ধারণা দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন—"এ বালক ভবিষ্যতে বড়লোক হইবে।"

"কালীকান্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে পাঠশালার চলিত অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহাকে কোলে করিয়া বাড়ী রাখিয়া আসিতেন। এই কালীকান্তের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরকালই ভক্তিমান্ ছিলেন।"

পাঠশালার বিদ্যা সাঙ্গ হইলে গুরু কালীকান্ত ঠাকুরদাসকে কহিলেন, "ইহার পাঠশালার লেখাপড়া সাঙ্গ হইয়াছে;

এ বালক বড় বুদ্ধিমান্; ইহাকে তুমি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া কলিকাতায় রাখ; তথায় ভাল করিয়া ইংরেজী বিদ্যা শিক্ষা দেও।" কালীকান্তের কথায় ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলিকাতায় আনিয়া অধ্যয়ন করাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স নয় বৎসর মাত্র। বীরসিংহ হইতে বৈদ্যবাটী ২৩ ক্রোশ পথ। এই দীর্ঘপথ কোমলকায় বালক হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস সঙ্গে লোক আনিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তাহা অস্বীকার করিয়া পথের দুই ধারে যাহা কিছু দেখিবার আছে তাহা দেখিতে দেখিতে আনন্দের সহিত পথ চলিতেছিলেন। খানিক দূর যাইয়া পথের মাঝে একটা মাইল ষ্টোন্ অর্থাৎ পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক মৃত্তিকায় প্রোথিত শিলাখণ্ড দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা বাটনা বাটবার শিলের মত এটা কি গা!" পিতা ঠাকুরদাস হাসিয়া কহিলেন, "ওটা বাটনা বাটবার শিল নয়, মাইলের চিহ্ন। ঐ দেখ, উহাতে উনিশের অঙ্ক লেখা আছে; তাহার মানে এই যে, এই স্থান কলিকাতা হইতে উনিশ মাইল দূরে।" ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময় ইংরেজী কিছুই জানিতেন না। শুধু পাঠশালায় বাঙ্গালা লেখাপড়া আর অঙ্ক শিখিয়াছিলেন। উনিশ যখন লিখিয়াছে, তখন এই অক্ষরটা এক আর এইটা নয়। তাহার পর ১৮ মাইলের দাগে আসিয়া ঠিক চিনিয়া লইলেন

যে এই অক্ষরটী আট। এইরূপ ভাবে দশ মাইলের দাগে আসিতে না আসিতেই তাঁহার সব কয়টী ইংরেজী অঙ্ক চেনা হইয়া গেল, তাহার পরদিনই কলিকাতায় পৌঁছিয়া কতকগুলি ইংরেজী অঙ্ক ঠিক দিয়া পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতা আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। দেখিতে সকলের চেয়ে ছোট, বয়সে সকলের কনিষ্ঠ, কিন্তু পড়ায় তিনি সকলের উপরে থাকিতেন। একদিনের জন্যও পড়ায় তাঁহাকে কেহ হারাইতে পারে নাই। কলেজে যাহা শিখিয়া আসিতেন প্রত্যহ পিতার নিকট রাত্রিকালে আবার তাহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেন। এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় যেন তাঁহাকে জাগাইয়া দেন। পিতা আর্ম্মাণি গির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন।

ইহার উপর গৃহকর্ম্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যম ভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথ বাবুর বাজারে আলু, পটল, কাটা মাছ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিতেন।

বাটনা বাটিয়া উনান্ ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্টযুক্ত বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানুশীলন করিতেন।

এইত অবস্থা! এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন, তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন ইহাতেই তাহা ব্যয়িত হইত। আবার দারোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির সময় দেশে গিয়া "দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।"*

ঈশ্বরচন্দ্র যাহাতে ভালরূপ লেখাপড়া শিখেন, সেদিকে তাঁহার পিতার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঠাকুরদাস কোপন-স্বভাব এবং কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। যেদিন তিনি দেখিতেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র পড়িবার সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, সেদিন আর রক্ষা ছিল না; তিনি এক একদিন

* বিদ্যাসাগর চরিত—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তাঁহাকে এমন ভয়ঙ্করভাবে শাসন করিতেন যে, তাহাতে বালকের প্রাণান্ত উপস্থিত হইত। পাছে নিদ্রা আসে বলিয়া তিনি আপনার চক্ষে সরিষার তেল দিতেন। তেলের জ্বালায় আর নিদ্রা আসিত না। এইরূপ কঠোর পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রতিভাবলে দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ব্যাকরণের পাঠ সমাপন করিয়া কাব্য শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন। পণ্ডিতবর জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এতটুকু ছেলে কি করিয়া সাহিত্য বুঝিবে?" ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "আমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখুন—না পারি কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।" তাহাতে তর্কালঙ্কার মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে খুব কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক এমন নিপুণতার সহিত সে সকলের উত্তর দিলেন যে, সে শ্রেণীর বড় বড় বালকেরাও কেহই তেমন উত্তর দিতে পারিল না। তর্কালঙ্কার মহাশয় তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ বালক সামান্য নহে। প্রথম বৎসরে ঈশ্বরচন্দ্র রঘুবংশ, কুমার সম্ভব, রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি সাহিত্য পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বৎসরে মাঘ, ভারবি, শকুন্তলা, মেঘদূত, উত্তরচরিত, মুদ্রারাক্ষস, কাদম্বরী, দশকুমার চরিত প্রভৃতি পাঠ করেন। সংস্কৃত কাব্যসকল ঈশ্বরচন্দ্র মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। যাহা একবার পাঠ করিতেন তাহা আর

কখন বিস্মৃত হইতেন না। তিনি পুস্তক না দেখিয়া সংস্কৃত নাটকাদি মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারিতেন। দ্বাদশবর্ষীয় বালক অনর্গল সংস্কৃত কথা বলিতে পারিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। বানান বা ব্যাকরণ ভুল, তাঁহার কখনও হইত না। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়া তদানীন্তন অধ্যাপকগণ একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "একদিন এই বালক দেশের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে।" দ্বিতীয় বৎসর সাহিত্য পরীক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম হন এবং সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য পারিতোষিক পান। এই হস্তাক্ষরের পারিতোষিকও ও তাঁহার বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল। এইরূপভাবে একে একে সাহিত্য, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন, ও স্মৃতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের অধ্যাপকগণও বিদ্বন্মণ্ডলী প্রদত্ত "বিদ্যাসাগর" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

সে সময়ে সংস্কৃত কলেজের উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের রচনা পরীক্ষা দিতে হইত। তাহাতে পদ্যের জন্য একশত টাকা, আর গদ্যের জন্য একশত টাকা, এই দুইটি পুরস্কার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রচনা লেখায় তাদৃশ উৎসাহী ছিলেন না, তিনি মনে করিতেন তাঁহার রচনা লেখা সেরূপ আসে না। তাই নির্দ্ধারিত রচনা পরীক্ষার দিন তিনি আর পরীক্ষার স্থানে যান নাই। সে সময় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া

বলিলেন "তাইত ঈশ্বর কোথায় ?" বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে ধরিয়া আনিয়া তিনি পরীক্ষায় বসাইয়া দিলেন। ঈশ্বর ভাবিলেন, "কি বিপদেই পড়িয়াছি।" কিন্তু শিক্ষক মহাশয়কে পিতার ন্যায় ভক্তি করেন, তাঁহার কথা কেমন করিয়া অমান্য করা যায় ? কাজেই কোনমতে যাহা পারিলেন, কয়েক ছত্র গদ্য আর কয়েক ছত্র পদ্য লিখিয়া দিয়া আসিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বোধ হয় তখন বড়ই লজ্জা বোধ হইয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষকেরা রচনা পড়িয়া দেখিলেন, তেমন সুন্দর আর কোন ছাত্রই লিখিতে পারে নাই। কাজেই দুইটী পুরস্কার তাঁহারই হইল।

বেদান্তের পর তিনি ন্যায় ও দর্শনের শ্রেণীতে উঠেন তাহার পরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম হওয়ায় একশত টাকা, আর কবিতা রচনার একশত টাকা পুরস্কার পান। এর পুরস্কারের টাকায় তাঁহার প্রভূত উপকার হইয়াছিল। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র একবার দুইমাসের জন্য মাসিক চল্লিশ-টাকা বেতনে ব্যাকরণের দ্বিতীয়শ্রেণীর শিক্ষকের কাজ করেন। দুইমাসের বেতন আশীটি টাকা পিতার হস্তে দিয়া বলিলেন—"বাবা এই টাকা দিয়া আপনি তীর্থ করুন।"

পিতা তীর্থে গিয়াছেন, এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র দর্শনের পরীক্ষায় একশত টাকা, কবিতা রচনায় একশত টাকা, আইন পরীক্ষায় পাঁচিশ টাকা, হাতের লেখার জন্য আট টাকা মোট

২৩৩৲ টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ফিরিয়া আসিলে সেই টাকা তাঁহার হাতে দিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন, "বাবা, এই টাকায় ঋণ শোধ করুন।"

এইরূপে বারে বৎসর পাঁচ মাস কাল হিন্দুকলেজে পড়িয়া, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, ন্যায়, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বিশেষ করিয়া অধ্যয়নের পর সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পাঠ সমাপনান্তে, কলেজ হইতেই প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

এইখানেই তাঁহার ছাত্র জীবনের শেষ। কলেজ ছাড়িয়া তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন তাঁহার সেই কর্ম্মজীবনের কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ম্মক্ষেত্রে—বিদ্যাসাগরের ইংরেজী-শিক্ষা—কর্ম্মগ্রহণ—সাহিত্যপ্রীতি—বন্ধুবাৎসল্য—মাতৃভক্তি।

ঈশ্বরচন্দ্র ছাত্রজীবনে যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া সর্ব্বত্র সুযশ লাভ করিয়াছিলেন, কর্ম্মজীবনেও তাঁহার সেই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল, বরং সেই সময়ে সর্ব্বতোভাবে নানাদিক দিয়া পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধারণের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। বিপদে নির্ভীকতা, কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মসংযম, আত্মসম্মান এবং পরোপকারে মুক্তহস্ততা এই সমুদায়ই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সাগরগামিনী পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশকে পবিত্রতার নির্ম্মলধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিল. আমরা তাঁহার কর্ম্মজীবন আলোচনা কালে তাহারই পরিচয় প্রদান করিব।

১৮৪১ খৃঃ অঃ (১২৪৮) এপ্রিল মাসে, বিদ্যাশিক্ষা সমাপন হইবামাত্রই তিনি ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রধান

পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় ঐ কার্য্যে উক্ত কলেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী মার্শেল সাহেবকর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। সে সময়ে বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবেরা ফোর্টউইলিয়ম কলেজে এই দেশের ভাষা যৎকিঞ্চিৎরূপে শিক্ষালাভ করিয়া তবে স্ব স্ব পদে নিযুক্ত হইতেন, কাজেই তৎকালে এই পদটি অত্যন্ত সম্মানজনক ছিল। প্রধান পণ্ডিতের পদ শূন্য হওয়ায় অনেকেই এই পদের প্রার্থী হইয়া ছিলেন, কিন্তু মার্শেল সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহার বিদ্যাবত্তার জন্য অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কারণ তিনি শুধু সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন না, একজন অসামান্য শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও ছিলেন। এই নিমিত্তই অন্যান্য বহুব্যক্তির জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াও ইংরেজ জাতির স্বভাবসিদ্ধ গুণগ্রাহিতা ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকেই নিযুক্ত করেন। এই নির্ব্বাচনে কেহই মার্শেল সাহেবকে কোনরূপ দোষারোপ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় এ সময়ে বীরসিংহ গ্রামে ছিলেন। তিনি কর্ম্মে নিযুক্তিপত্র পাইয়াই কলিকাতায় আগমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এইরূপ প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনিও কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রেরা মাসে মাসে পরীক্ষা দিতেন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাঁহাদের একটা সময়

নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে তাহাদিগকে বিলাত ফিরিয়া যাইতে হইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় মাসে মাসে তাঁহাদের পরীক্ষার কাগজ পরীক্ষা করিতেন। "অধ্যাপনে পণ্ডিত হইলেও, কার্য্যে তাঁহার ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক; সুতরাং তাঁহার ইংরেজি শিখিবার প্রয়োজন হইল। তদ্ব্যতীত তাঁহাকে হিন্দী পরীক্ষার কাগজপত্রও দেখিতে হইত। কাজেই হিন্দী শিক্ষারও আবশ্যক হইল। ইংরাজী শিক্ষা অপেক্ষা হিন্দী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা, বাঙ্গলা ও সংস্কৃতের সঙ্গে হিন্দীর অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তিনি মাস কতক পরিশ্রম করিয়া একজন হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট হিন্দী শিখিয়া লইলেন।" ইংরেজী শিক্ষা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর হইলেও তিনি প্রত্যহ প্রাতে ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় নামক একজন ইংরেজী ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন, ইংরেজী অঙ্ক শোভাবাজার রাজবাড়ীর কতিপয় সুশিক্ষিত যুবকের নিকট শিক্ষা করেন। তৎপর তিনি শোভাবাজার রাজবাটীর স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসুর নিকট বিশ্বসাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক সেক্সপীয়রের নাটকসমূহ অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। সে সময়ে আনন্দ-কৃষ্ণ বাবুর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি কলিকাতা সহরে সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত ছিল। আনন্দবাবু অত্যন্ত আনন্দের সহিত

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত কাব্যালোচনা করিতেন। এইখানে তাঁহার সহিত স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের পরিচয় হয়। "তখন অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর সহিত আনন্দকৃষ্ণবাবু প্রমুখ অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য লোকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আনন্দকৃষ্ণ বাবুর মুখে শুনিয়াছি—'বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়বাবু উভয়েই রাজবাটীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইংরেজী সাহিত্য ও গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তাহারা ছাদের উপর বসিয়া খড়ি দিয়া অঙ্ক পাতিয়া, জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেন। মাস পাঁচ ছয় পরে বিদ্যাসাগর অঙ্কবিদ্যা পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি ছিল না। অতঃপর তিনি সেক্সপীয়র পড়িতেন। তিনি ইহা শীঘ্রই আয়ত্তও করিয়াছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। কর্ম্মজীবনের এই প্রথম অবস্থা হইতেই তাহার সূত্রপাত। "যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রী-গণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোক দুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনা স্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানব জীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত কুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি

তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।" জগদীশ্বরের অনুগ্রহে কবির এই বাণী সার্থক হইয়াছে। বঙ্গভাষা জননী আজ গৌরবশালিনী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহের মধ্যে পরিগণিত, ইহার মূলে বিদ্যাসাগরের ন্যায় ভক্তসেবক যে কিরূপ আত্মোৎসর্গ ও অক্লান্ত পরিশ্রম: করিয়াছেন এখানে তাহার পরিচয় দিতেছি।

অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি নানাভাবে সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন। অক্ষয়বাবু ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যগণ তাহাকে তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত "পেপার কমিটির" সদস্যপদে মনোনীত করেন। অক্ষয়বাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন অনুরক্ত বন্ধু ছিলেন।

কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। তাঁহার কার্য্যকারিতা ও বিচক্ষণতা দর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন।

১৮৫১ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ উঠাইয়া দিয়া যখন অধ্যক্ষের পদ সৃষ্ট হইল, তখন তিনি ১৫০৲ টাকা বেতনে এই নব প্রতিষ্ঠিত অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন এবং ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া এই পদের বেতন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা হইল। কলেজে কাজ করিবার সময় তিনি উহার নানাভাবে সংস্কার সাধন করেন। পূর্ব্বে

ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোন জাতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারিত না, তিনি এই নিয়ম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সমস্ত হিন্দু সন্তানকে অধ্যয়নার্থ অবাধে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করেন।

তিনি যখন বাসায় ইংরেজী শিখিতেন, সে সময়ে হাইকোর্টের অন্যতম অনুবাদক শ্যামচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপধ্যায় প্রভৃতি অনেকে তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এমনই কৌশলের সহিত তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন যে, অতি জটিল বিষয়-সমূহও অতি সহজে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত হইত।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্য্যকালে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিং বাহাদুর বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত পাশ্চাত্য বিদ্যালয়ের আদর্শে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসরের মধ্যে একশত একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল বিদ্যালয়ের নিযুক্ত শিক্ষকগণের পরীক্ষা গ্রহণ ও নিযুক্ত করিবার ভার বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মার্শেল সাহেবের উপর অর্পিত হয়। এই সময় তাঁহার পিতা ঠাকুরদাস কার্য্যস্থল হইতে বাসায় ফিরিতে দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আঘাত প্রাপ্ত হন। ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় একান্ত দুঃখিত হন; পিতাকে কর্ম্মত্যাগ

করিতে বাধ্য করেন। পিতা ঠাকুরদাস পুত্রের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসীম শ্রমশীলতার, কর্ম্মনিপুণতার ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রভাবে উচ্চপদস্থ সাহেব কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কলেজের অধিকাংশ কার্য্যই তাঁহার পরামর্শানুযায়ী নিষ্পন্ন হইত। "যে সময়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল, সেই সময়ে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শম্ভূচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার জননী তাঁহাকে বাটী যাইতে আদেশ করিয়া পাঠান। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ মার্শেল সাহেবের কাছে ছুটি চাহিলেন। কিন্তু যে সময়ে এত বেশী কাজ যে, বিশৃঙ্খলা ভয়ে সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ছুটি দিতে সম্মত হইলেন না। সুতরাং তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। কলিকাতার বাসার সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, কেবল তিনিই আছেন। সহোদরের বিবাহ, জননী গৃহে যাইতে বলিয়াছেন, তিনি ছুটি পাইলে না; জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিয়া মনে দারুণ ক্লেশের সঞ্চার হইল। বর্ষার ঘন মেঘাচ্ছন্ন রজনীর অন্ধকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়াকাশও গভীর

বিষাদ মেঘে আবৃত হইল। অন্তর্দাহ উৎকণ্ঠা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। তিনি অনিদ্রায় বহুকষ্টে রাত্রি যাপন করিয়া শেষে প্রাতঃকালে মার্শেল সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমার মা আমাকে বাড়ী যাইতে বলিয়াছেন, আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে। যদি বিদায় না দেন আমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলাম, মঞ্জুর করুন আমি বাড়ী যাইব।" সাহেব মাতৃভক্তির এই স্বর্গীয় দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না, আমি বিদায় দিতেছি, তুমি বাড়ী যাও।" তখন হৃষ্টচিত্তে বাসায় আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলেন। আহারের পর ভৃত্য শ্রীরামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। সে সময়ে প্রবল বর্ষাসমাগমে পথ অতি দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে, বহু কষ্টে এক এক পা অগ্রসর হইতে হইয়াছে, এইরূপ ক্লেশে কতকদূর অগ্রসর হইয়া সেদিন দামোদরের পূর্ব্বপারেই রাত্রি যাপন করিতে হইল। পরদিন শ্রীরামকে পথ চলিতে অসমর্থ দেখিয়া পথে ফলার করাইয়া ও কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন; তাহাকে বাড়ী যাইতে বলিলেন। সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর আদেশমত বাড়ী গেল। ঈশ্বরচন্দ্রকে সেদিন যে কোন উপায়েই হউক বাটী পৌঁছিতেই হইবে। সেই দিনই বিবাহ। তিনি জানিতেন, তিনি বাড়ী না গেলে জননীর আর দুঃখের সীমা থাকিবে না। এই ভাবনার তাড়নায়

তিনি ত্বরিতগমনে পথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই ভীষণকলেবর দামোদর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দামোদরে বর্ষার জল নামিয়াছে, একগাছি তৃণ পড়িলে শতখণ্ড হইয়া যায়। পূর্ণকলেবর দামোদর প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া তীরবেগে ছুটিয়াছে। পারের নৌকা পরপারে, নৌকা আসিয়া লইয়া গেলে সেদিন আর গৃহে যাওয়া হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় আব্দারে মায়ের আদেশ প্রতিপালনের জন্য বর্ষার ভরা দামোদরের জলোচ্ছ্বাসে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন। যাহারা পারে যাইবে বলিয়া বসিয়া ছিল তাহারা অনেক নিষেধ করিল, কেহ কেহ বাধাও দিল, কিন্তু মাতৃ-আজ্ঞা পালনে বদ্ধপরিকর ঈশ্বরচন্দ্র কোন বাধাই মানিলেন না। সবলদেহ বীরপুরুষ দামোদরের তরঙ্গ সংগ্রামে জয়ী হইয়া পরপারে উঠিলেন। পথে পাতুলে জননীর মাতুলালয়ে মধ্যাহ্নক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপরাহ্নে দারকেশ্বর নদও পূর্ব্ববৎ পার হইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা হইল। যেখানে সন্ধ্যা হইল সেখানে আবার দস্যুভয়। সুবিধামত কোন পথিককে একাকী পাইলে প্রায় গৃহে ফিরিতে দেয় না। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় প্রহরার্দ্ধ রাত্রি অতীত হইয়াছে এমন সময়ে বিদ্যাসাগর গৃহে

পৌঁছিলেন। সেই সিক্তবস্ত্রে ও ক্লান্ত শরীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া, "মা—মা ; আমি আসিয়াছি" বলিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন। বর ও বরযাত্রী চলিয়া গিয়াছে, জননী এক ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে মর্ম্মাহত হইয়া অনাহারে রোদন করিতেছিলেন। পুত্রের গলার শব্দ পাইয়া জননী অশ্রুমোচন করিতে করিতে পুত্রের নিকট আসিলেন। তখন মা ও ছেলে ক্ষণকাল একত্রে ক্রন্দন করিয়া শেষে নানাপ্রকার সুখ দুঃখের কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে দুইজনে আহার করিতে বসিলেন।"

সংস্কৃত-কলেজের উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কিরূপে ব্যবস্থা করিলে উহার কল্যাণ হয়, কিরূপভাবে অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। বিদ্যাসাগর বাঙ্গলা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের যে উপক্রমণিকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা দেশমধ্যে সাধারণতঃ সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে যে সব প্রস্তাব করিতেন সেক্রেটারী তাহা অনুমোদন করিতেন না, এইরূপ মতান্তরে উভয়ের মধ্যে মনান্তর হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিরহিতকারী বন্ধু মার্শেল

সাহেবের অনুরোধে তিনি পুনরায় কর্ম্মগ্রহণ করেন এবং ক্রমশঃ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও অতিরিক্ত ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হন ; এই পদে তাঁহার বেতন ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কিন্তু পুনরায় শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের সহিত মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কর্ম্মত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের প্রভাব।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলাভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দঃ-স্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালাগদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া ৬০০৲ ছয়শত টাকা ঋণ করিয়া "সংস্কৃতযন্ত্র" নামক একটি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রেসে তিনি সর্ব্বাগ্রে কৃষ্ণনগরের মহারাজার বাটী হইতে হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করিয়া ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী মুদ্রিত করেন। মার্শেল সাহেব ফোর্টউইলিয়ম কলেজের জন্য ৬০০৲ ছয়শত টাকায় একশত খণ্ড ভারতচন্দ্র ক্রয় করেন, এই টাকায় তাঁহার ঋণ পরিশোধ হয়। অতঃপর তিনি "বোধোদয়" রচনা ও প্রকাশ করেন।

১৮৫১ সালের ৬ই এপ্রিল বা ১২৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় চেম্বর সাহেবের Rudiments of knowledge" নামক গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত "শিশুশিক্ষা" প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন ভাগ প্রচারিত হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমতঃ এই গ্রন্থের নাম "শিশুশিক্ষা" চতুর্থভাগ এই নাম দিয়াছিলেন।

১৯০৮ সংবত, ১২৫৮ সালে ১লা অগ্রহায়ণ বা ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নবেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়, উপক্রমণিকা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন; অতঃপর ১৯০৮ সংবত ১লা অগ্রহায়ণ ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। ঋজুপাঠ—সংগ্রহ গ্রন্থ।

ঋজুপাঠ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সংস্কৃত সাহিত্যের পুরাণের সার সঙ্কলন। ১৮৫৩ খৃঃ অঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত তৃতীয় ভাগ ঋজুপাঠ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়; উহা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ ছিল। ইহাও সংগ্রহ গ্রন্থ। এই বৎসরেই তিনি "ব্যাকরণ কৌমুদীর" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত করেন। ১৮৫৪ খৃঃ অঃ ঠিক এক বৎসর পরে "ব্যাকরণ কৌমুদী" তৃতীয় ভাগ মুদ্রিত হয়। কৌমুদীর তিন ভাগ উপক্রমণিকার উচ্চতম সোপান। ১২৪৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ তাঁহার অনূদিত শকুন্তলা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ইহা সংস্কৃত "অভিজ্ঞান শকুন্তলের" অনুবাদ। শকুন্তলার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "চরিতাবলী", "সীতার বনবাস" প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয় প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২৬৮ সালের ১লা বৈশাখ বা ১৮৬১ খৃঃ অঃ ১২ই এপ্রিল সীতার বনবাস প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ খৃঃ অঃ জুলাই মাসে বাঙ্গালা ১২৬৩ সালের ১লা শ্রাবণ চরিতাবলী মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষার প্রাণে এক অভিনব শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন।—"বর্ণ পরিচয়" হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্মদাতা, বিরামচিহ্নের সৃষ্টিকর্ত্তা, সমাজসংস্কারক, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিভার, মনীষার, সকল বিষয়েই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। মাতৃভক্ত ও মাতৃভাষানুরাগী মহাত্মা বিদ্যাসাগরের

অক্লান্ত সাহিত্যসাধনায় জননীর যশের যে তুফান উঠিয়াছিল তাহার প্রভাব চিরদিন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিয়া বাঙ্গালার ও বাঙ্গালা ভাষার গৌরব অক্ষয় রাখিবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রী-শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, বিধবা বিবাহ ইত্যাদি।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"। বিদ্যাসাগর মহাশয় একথা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। বিটন সাহেব তৎকালে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং শিক্ষা-সমাজের সভাপতি ছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য ইনি কলিকাতায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এই মহৎকার্য্যে বিশেষরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। বিটন সাহেব কলিকাতায় যে যে বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহা এখন বেথুন স্কুল ও কলেজ নামে পরিচিত। বিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনি

কন্যার মত স্নেহ করিতেন। কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মা, কাহাকেও মাসী, এইরূপ সম্বোধন করিয়া নানা মধুর বাক্যে ও উপহারে তাহাদিগকে প্রীত করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল ইন্সপেক্টার হইয়া হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়া জেলার বহুগ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং অনেক স্থানের ধনবান্ লোকদিগকে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য উপদেশ দেন—ফলে তাঁহার তত্ত্বাবধানের নানাস্থানে অত্যল্প সময়ের মধ্যে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় তদানীন্তন ছোটলাট হ্যালিডে সাহব মহাশয়েয় আদেশক্রমে বহু বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের সমাজসংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য আইন প্রণয়ন জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া বলা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

যে গুণের জন্য বিদ্যাসাগর বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রে চির বিরাজিত সেইটির নাম দয়া। জগতে দীন, দুঃখী, কাঙ্গাল, দরিদ্রের বন্ধু তাঁহার ন্যায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখীর দুঃখের কথা শুনিলেই তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হইত।

বাল্যে—ছাত্রজীবনে সকল সময়েই তাঁহাকে পরের দুঃখে বিগলিত হইতে দেখিতে পাই। কি করিলে পৃথিবীর নরনারীর সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ বিদূরিত হয় তাঁহার জীবনে উহাই ছিল এক মহামন্ত্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন কলিকাতায় পড়িতেন সে সময়ে ছুটিতে বাড়ী যাইয়া প্রত্যেক প্রতিবেশীর ঘরে ঘরে তাহাদের প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান লইতেন, যাহার খাওয়ার থাকিত না, তাঁহাকে তাঁহার ক্ষুদ্র বৃত্তির টাকা হইতে খাদ্যদ্রব্যের জন্য দান করিতেন। তাঁহার দয়া কোন সমাজ বা জাতির মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। উহা দেবতার বৃষ্টি-ধারার ন্যায়, সূর্য্যের কিরণের ন্যায় ও বায়ুর প্রবাহের ন্যায় সর্ব্বজাতির মধ্যেই অজস্রভাবে বর্ষিত হইত। যেখানে দীন দুঃখী নিঃসম্বল—সেখানেই বিদ্যাসাগরের কল্যাণ

হস্ত। যেখানে পতিবিয়োগবিধুরা বালিকার করুণ দৃষ্টি সেইখানেই বিদ্যাসাগরের অভয়বাণী, যেখানে ব্যাধিনিপীড়িত দীনদরিদ্র অর্থাভাবে হাহাকার করিতেছে, সেইখানেই তাঁহার করুণ কোমল বদনের শুভ্র জ্যোৎস্নাময় হাসি। পরের মঙ্গল-মন্দিরে এইরূপ নিঃস্বার্থভাবে আপনাকে বিলাইয়া দিতে পৃথিবীতে কয়জনকে দেখিতে পাওয়া যায়? বাঙ্গলাদেশ-বাসীর বহুপুণ্যফলে বিদ্যাসাগর এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃকালে কলিকাতার প্রান্তস্থিত কোন রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, সহসা দেখিলেন একটি বৃদ্ধা অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়া পথের পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়াই তিনি মললিপ্ত বৃদ্ধাকে পরম যত্নে ক্রোড়ে করিয়া আনিলেন, এবং উহার উপযুক্তরূপে চিকিৎ-সার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বৃদ্ধা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন তাহার সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতেন।

"একবার একটি ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোক শিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট আসে। সেই রমণী উপরে আসিলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বসিবার আসন দিয়া সবে এই কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন যে, "সহরে বড় বড় ইংরেজ আছে তাদের কাছে তোমরা কেন যাও না—"এমন সময় দেখিলেন স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত হাঁপাইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিতে

সে বলিল সে অনাথা বিধবা, তাহার পুত্রকন্যা অনেকগুলি, উপায় কিছুই নাই। ইহার উপরে তাহার আবার শ্বাসকাশ হইয়াছে! অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া স্বয়ং পাখা লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন ও পরে তাহাকে সমুচিত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।"

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে যাহার প্রতি বিরক্ত থাকে, যাহার চরিত্র দেখিয়া ঘৃণা করে, তাহাকে আর দয়া করিতে পারে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্র এমনি বিচিত্র ছিল যে, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়া কোন জাতি বা সম্প্রদায়ে বদ্ধ ছিল না। উহা আকাশের মত উদার ও উন্মুক্ত ছিল। প্রতি কার্য্যেই তাহা প্রকাশ পাইত। বর্দ্ধমানে যখন এপি-ডেমিক জ্বরের বড় প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর উহা শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন নাই। নিজের ব্যয়ে একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবং শত শত লোকের মত ঔষধ ও পথ্য লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে গেলেন; এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ঔষধ ও পথ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহার পরহিতৈষিতা দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছিল।

বালবিধবার মলিন মুখচ্ছবি দেখিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিত, একেবারে কাঁদিয়া ফেলিতেন। একটি ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—"অনেকদিন হইল আমাদের বাসাতে পাড়ার একটি বালিকা খেলিতে আসিত। মেয়েটির বয়স তখন আট কি নয় বৎসর। মেয়েটি অতি সুশ্রী ছিল, তাহার মুখখানি এমন সুন্দর যে দেখিলেই ভালবাসিতে হয়। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাসাতে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে আসিতেন। একদিন তিনি সেই বালিকাটিকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন 'বা! বেশ মেয়েটি কার মেয়ে হে!' আমরা বলিলাম, 'মহাশয় ওটি পাড়ার একটি নাপিতের মেয়ে। ওটি বিধবা।' 'ওটি বিধবা।'—যেই এই কথা বলা হইল, অমনি বিদ্যাসাগর মহাশয় যে এত হাসিখুসি আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, সে হাস তাঁহার মুখ হইতে পলায়ন করিল; এবং আমরা দেখিলাম তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা গড়াইতেছে। তিনি মেয়েটিকে বলিলেন, "আয় মা, আমার কাছে আয়," এই বলিয়া সেই নাপিতের মেয়েটিকে নিজ কোলে বসাইলেন ও অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি যাইবার সময় সেই মেয়েটিকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইতে আদেশ করিয়া গেলেন। তদনুসারে পরদিন আমরা মেয়েটিকে

তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইলাম। অপরাহ্নে দেখি মেয়েটি পরম আদর লাভ করিয়া দুই জোড়া নববস্ত্র পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।”

আর একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় এক রাজাদের বারান্দাতে বসিয়া বাড়ীর কর্ত্তাদের সহিত গল্প করিতেছেন। রাত্রি দুই চারি দণ্ড হইয়াছে। এমন সময়ে একটি পথভিখারী রাজাবাবুদের দ্বারে আসিয়া ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিতেছে। তাহার চীৎকারে বাবুদের বড়ই বিরক্তি হইতেছে। অমনি দ্বারবান্ গলাধাক্কা দিয়া প্রহার করিতে করিতে তাহাকে দূরে লইয়া চলিল। ধনীর দ্বারে দরিদ্রের এই নিগ্রহ দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অমনি রাজাবাবুদের নিকট বিদায় লইয়া নামিয়া আসিলেন ও সেই পথভিখারীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাকে বলিলেন—“দেখ্, তুই যদি আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করিস্ ত তোকে আমি একটা টাকা দি।” সে তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন —“তুই প্রতিজ্ঞা কর যে এ বাড়ীতে আর ভিক্ষা করিতে আস্‌বি না।” এই বলিয়া তাহার হাতে একটা টাকা দিয়া প্রস্থান করিলেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে বলিলেন—“দেখ, কুলুটোলার অমুকগলির

অমুক নম্বর বাড়ীতে এই নামে একজন মান্দ্রাজবাসী আছেন। জানিয়াছি তিনি অর্থাভাবে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। অতএব তুমি তথায় গিয়া সবিশেষ সংবাদ লইয়া আইস।” বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদেশে কর্ম্মচারী নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া, প্রথম গৃহস্বামীর দেখা পাইলেন। তাঁহার নিকট উক্ত মান্দ্রাজবাসীর নামোল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন —“হাঁ! আমার এই বাটীর নিম্নতলস্থ গৃহে তিনি সপরিবারে বাস করেন। আমি তাঁহার নিকট দুই মাসের ভাড়া ৩০৲ টাকা পাইব। তিনি উহা দিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে ভাড়া পরিশোধ করিয়া উঠিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছি। কিন্তু কি করি, তিনি অর্থাভাবপ্রযুক্ত আজ দুই তিন দিন সপরিবারে অনাহারে রহিয়াছেন।” কর্ম্মচারী গৃহস্বামী এই কথা শুনিয়া উক্ত মান্দ্রাজবাসীর নিকট যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি একটা সঙ্কীর্ণ গৃহে পাঁচটি কন্যা ও দুইটী অল্পবয়স্ক পুত্র লইয়া সামান্য দরমার উপর বসিয়া রহিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণ রুগ্ন ও অনাহারে শীর্ণ। কর্ম্মচারী এই শোচনীয় দশাগ্রস্থ মান্দ্রাজবাসীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলে তিনি কহিলেন,—“আমি এই কলিকাতা সহরে অনেক বড়লোকের নিকট আমার কষ্ট জানাইয়াছিলাম; কিন্তু কেহই আমার দুরবস্থায় দয়ার্দ্র হইয়া একটি কপর্দ্দক দিয়াও আমার সাহায্য করেন নাই। অবশেষে একটি বাবুর নিকট ভিক্ষার্থে

উপস্থিত হই। তিনি ভিক্ষা না দিয়া একখানি পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'এই সহরে এক পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর আছেন, আমি তাঁহারই নামে তোমার দুরবস্থার কথা লিখিয়া দিলাম। পত্রখানি ডাকঘরে দিয়া আইস।' আমি তদনুসারে উক্ত পত্র ডাকঘরে দিয়াছি। এখন আমার অদৃষ্ট।" কর্ম্মচারী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে এ সকল কথা জানাইলেন। শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে ঐ কর্ম্মচারী মহাশয়ের হস্তে মান্দ্রাজবাসীর বাড়ীভাড়া দেনা ৩০৲ টাকা খোরাকী ১০৲ টাকা এবং তাহাদের জন্য নয় খানি কাপড় দিয়া বলিলেন—"যদি তারা বাড়ী যায় তাহা হইলে কত হইলে চলিতে পারে জানিয়া আসিবে। আর এখানে থাকিলে আমি প্রতি মাসে ১৫৲ টাকা দিব।" কর্ম্মচারী যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া, উক্ত মান্দ্রাজবাসীকে টাকা ও কাপড় দিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা জানাইলেন। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগরের অসীম দয়ায় দুঃখী মান্দ্রাজবাসী স্ত্রীপুত্রের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন—"একশত টাকা হইলে আমরা সকলে স্বদেশে যাইতে পারি।" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মচারীর হস্তে উক্ত টাকা দেন। কর্ম্মচারীও তাঁহাদিগকে ষ্টীমারে রাখিয়া আইসেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয়, একটী বন্ধুর সহিত

কলিকাতার সিমলা হেদুয়ার নিকট পাদচরণ করিতেছিলেন। সেই সময় একটি ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া অতি বিষণ্নভাবে তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের চক্ষে জল পড়িতেছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আপনি কাঁদিতেছেন কেন?" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতা ও মোটা চাদর দেখিয়া সামান্য লোক বোধে ব্রাহ্মণের কোন কথাই বলিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে তিনি বলিলেন—"আমি এক ব্যক্তির নিকট টাকা ধার করিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, কিন্তু সে টাকা পরিশোধ করিতে অক্ষম। ঋণ আদালতে আমার নামে নালিশ করিয়াছে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোকদ্দমা কবে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "পরশ্ব।" ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসাগর মহাশয় মোকদ্দমার নম্বর ব্রাহ্মণের নাম ধাম প্রভৃতি একে একে সব জানিয়া লইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে পর, তিনি সঙ্গী বন্ধুটিকে মোকদ্দমার প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে বলেন। তথ্যানুসন্ধানে ঠিক হয়, ব্রাহ্মণের কথা সত্য, দেনা তাঁর সুদে আসলে ২৪০০৲ টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় ২৪০০৲ টাকাই আদালতে জমা দেন। তিনি আদালতের উকীল আমলাকে বলিয়া রাখেন—"আমার নাম যেন প্রকাশ না হয়; নাম প্রকাশের জন্য ব্রাহ্মণ যে পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হইবে, আমি তাহা দিব।"

ব্রাহ্মণ মোকদ্দমার দিন উপস্থিত হইয়া বুঝিলেন, কোন পুরুষোত্তম তাঁহার দেনা পরিশোধ করিয়াছেন। তিনি বহু চেষ্টায়ও উদ্ধারকর্ত্তার নাম জানিতে না পারিয়া বিষাদ পুলকে বাড়ী ফিরিয়া যান।

বর্দ্ধমানের দুঃস্থ দরিদ্রমাত্রই বিদ্যাসাগরকে দয়ারসাগর ও দাতা বলিয়া চিনিত। তিনি ট্রেণ হইতে ষ্টেশনে নামিলেই তাহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। একবার অতি দীনহীন মলিন বালক তাঁহার নিকট পয়সা ভিক্ষা চাহে। তাহার কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ দেহ ও ধূলি-ধূসরিত মলিন মুখখানি দেখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন। তাহার দারিদ্র্য-মালিন্যক্লিষ্ট মুখে কি যেন একটু জ্যোতিঃপ্রভা মিশ্রিত ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই জন্যই একটু কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, তাহার সহিত একটু ঘনিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"আমি যদি চারিটী পয়সা দিই।" বালক ভাবিল—চাহিলাম একটি, ইনি দিতে চাহেন চারিটী ; এ কেমন বুঝি ঠাট্টা করিতেছেন। তখন সে বলিল, "মহাশয় ঠাট্টা করেন কেন, দিন একটী পয়সা।" বিদ্যাসাগর মহাশয়, বলিলেন "ঠাট্টা নহে, যদি চারিটী পয়সা দিই, তাহা হইলে কি করিস্?" বালক বলিল—"তা হলে দুটী পয়সা খাবার কিনি আর দুইটী পয়সা মাকে গিয়া দিই।" বিদ্যাসাগর

বলিলেন---"যদি দুই আনা দিই।" এইবারও বালক ঠাট্টা মনে করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবার তাহার হাত ধরিয়া বলেন—"বল না, সত্যি সত্যি তাহ'লে কি করিস্?" তখন বালক চক্ষের দুফোঁটা জল ফেলিয়া বলিল—"চার পয়সার চাল কিনে নিয়ে যাই। আর চার পয়সা মাকে দিই। তাতে আমাদের আর এক দিন চল্‌বে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার বল্‌লেন—"যদি চার আনা দিই।" বালক তখনও বিদ্যাসাগরের মুষ্টিগত; উত্তর দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সে বলিল—"তা হ'লে দুই আনা দুদিন খাওয়া চলবে, আর দুই আনার আম কিনি। আম কিনে বেচি। দু আনা আমে চার আনা হবে। তাহ'লে আবার দু দিন চলবে। আবার দু'আনা আম কিন্‌বো। এমন করে যতদিন চলে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাহাকে একটি টাকা দিলেন। বালক টাকা লইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে চলিয়া গেল। বৎসর দুই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়, একবার বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন। তিনি ষ্টেশনে নামিয়া প্রায়ই একটি পরিচিত দোকানদারের দোকানে বসিতেন। এবার তিনি যেমন সেই পরিচিত দোকানদারের দোকানে প্রবেশ করিতে যাইবেন অমনই একটি হৃষ্টপুষ্ট বালক আসিয়া বলিল, "মহাশয়! একবার আসুন আমার দোকানে বস্‌তে হবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন,

"তুমি কে, আমিত তোমাকে চিনি না। তোমার দোকানে কেন যাইব ?" বালক তখন বাষ্পাকুলিতলোচনে বলিল— "আপনার স্মরণ নাই। আজ দুই বৎসর হলো, আমি আপনার কাছে একটি পয়সা চেয়েছিলুম। আপনি আমাকে একটি টাকা দিয়াছিলেন। সেই এক টাকার দু'আনার চাল কিনি আর বাকী চৌদ্দ আনায় আম কিনে বেচি। তাতে আমার বেশ লাভ হয়। তারপর আবার আম কিনে বেচি। ক্রমে লাভ বাড়তে থাকে। এটা সেটা বেচে বেশ পুঁজি হয়। এখন এই মনিহারী দোকানখানি করেছি।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তখন পূর্ব্বের কথাটি স্মরণ হইল। তিনি বালককে আশীর্ব্বাদ করিয়া, তাহার সন্তোষ জন্য দোকানে যাইয়া বসিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর এমনই দয়ার সাগর ছিলেন। তাঁহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইয়া কেহ কোন দিন রিক্ত হস্তে ফিরিত না। মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগরে কাছে কেহ "আমার মা নাই" এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার ধারা উথলিয়া উঠিত। মা নামে বিদ্যাসাগর মন্ত্রমুগ্ধ হইতেন। 'মা'ইযে তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গান বাজনার বড় সখ ছিল না। তবে কেহ কখন মা মা বলিয়া গান গাহিলে, তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। গায়ককে যেন বুকের

কলিজার ভিতর পূরিয়া রাখিতেন। একজন অন্ধ মুসলমান ভিক্ষুক বেহালা বাজাইয়া শ্যামা-সঙ্গীত গাহিত। সে সঙ্গীতে "মা মা" থাকিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে ডাকাইয়া প্রায়ই গান শুনিতেন। গান শুনিতে শুনিতে তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এই মুসলমান ভিক্ষুক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট সময় সময় যথেষ্ট সাহায্য পাইত। একবার ইহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় গৃহনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় দিয়াছিলেন।

কবি মধুসূদনের নাম বাঙ্গলাদেশের ছোট বড় সকলের নিকট সুপরিচিত। মধুসূদন ১২৬৯ সালে বা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন। বিলাত রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সম্পত্তি কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ মোক্তারের নিকট পত্তনী দিয়াছিলেন, কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থ রাজা সেই পত্তনীদারের নিকট টাকা আদায় করিয়া লইয়া পাঠাইবার ভার লইয়াছিলেন। বিলাত যাইয়া মাইকেল প্রথম কয়েকবার নিয়মিতভাবে টাকা পাইয়াছিলেন, তারপর পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াও কোন উত্তর পান নাই; সেই দূরদেশে তাঁহার অর্থাভাবের কষ্টের পরিসীমা ছিল না, এমন কি তাঁহার কারাবাসে যাইবার পর্য্যন্ত উপক্রম হইয়াছিল। মধুসূদন সুদূর দেশ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট তাঁহার অবস্থা বর্ণনা করিয়া অতি করুণভাবে এক

পত্র লিখিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পত্র পাঠে মাইকেলের দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন; তাঁহার হস্তে তখন কপর্দ্দকও ছিল না, কিন্তু কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ ৬০০০, ছয় সহস্র টাকা ঋণ করিয়া মাইকেলকে পাঠাইয়া দিলেন। মাইকেল এক সঙ্গে এতগুলি টাকা পাইয়া নবজীবন লাভ করিলেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাইকেল বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাগমন করেন। মধুসূদন পূর্ব্বেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কলিকাতায় আগমনের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অমিতব্যয়ী মাইকেল নিরন্ন অবস্থায় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার জন্য একটি তেতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া অতি সুন্দর-রূপে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাইকেল কিন্তু সে বাড়ীতে না উঠিয়া একটা হোটেলে উঠিলেন। পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সেই হোটেল হইতে বাটীতে লইয়া আসেন। এবং তাঁহার ব্যারিষ্টারি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য যেরূপ যোগাড় যন্ত্র আবশ্যক সে সমুদয় নিষ্পন্ন করিয়া দেন।

ব্যারিষ্টার হইয়াও নানাকারণে তিনি ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। এই সময় তাঁহার কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার দ্বারা কতকটা আয় থাকিলেও পান দোষে ও বিবিধ অমিতব্যয়ে

পারিবারিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতে। প্রতিভাশালী মাইকেলকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যেমন মধুসূদনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, মাইকেলও তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তাহা হইলে কি হইবে, মধুসূদনকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ-সমুদ্র হইতে বাঁচাইতে পারিলেন না। এই অক্ষমতার মূল কারণ অতীব অমিতব্যয়িতা।

মধুসূদনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহা করিয়াছিলেন, দেশের অতি বড় অর্থশালী ব্যক্তিও তাহা করেন নাই। পক্ষিমাতা যেমন শাবককে বক্ষে ধরিয়া ঢাকিয়া রাখে, তিনিও তেমনি স্নেহের নীড়ে মাইকেলকে বাহিরের সমুদয় ঝড় ঝঞ্ঝা ও অশনিসম্পাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তাই বড় দুঃখে দয়ার সাগর বিদ্যারসাগর লিখিয়াছিলেন, "তোমাকে রক্ষা করিবার শক্তি কাহারও নাই।"

মাইকেল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ ছিলেন, মাঝে মাঝে সংসর্গদোষে বা অভাবগ্রস্ত হইয়া মতিভ্রমবশতঃ মতান্তর হইলেও চিরদিনই তিনি তাঁহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। মধুসূদন যে অক্ষয়, অমর অমিত্রাক্ষরের মধুর ছন্দে বীরমদে বঙ্গদেশকে প্রমত্ত

করিয়া গিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের ন্যায় প্রকাণ্ড মহীরুহের শীতল ছায়ায় না থাকিলে তাহা সম্ভবপর হইত কি না কে বলিতে পারে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মধুসূদনের এই পুণ্যকাহিনী প্রত্যেক বঙ্গবাসী পাঠ করিয়া মুগ্ধ, বিস্মিত ও পুলকিত হইবে, এবং কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সকলে সমস্বরে চিরদিন গাহিবেন—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

লোকশিক্ষা, চরিত্র সমালোচনা, তেজস্বিতা, নিন্দায় মহত্ত্ব, জাতীয় সম্মান।

জাতীয় গৌরব ও জাতীয় সম্মান যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সতত লক্ষ্য ছিল। তিনি জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। প্রত্যেক অনুষ্ঠিত কার্য্যেই তাঁহার নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। তিনি যে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে কত বড় শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন সে কথা বাক্যে বা ভাষায় সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয় না।

শিক্ষা বিস্তার করিতে তিনি চিরদিনই উৎসাহী ছিলেন। "মেট্রপলিটান্" বিদ্যালয় স্থাপন সেই আকাঙ্ক্ষার ফল। কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যখন স্বাধীনভাবে সাহিত্যসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সেই সময়েই ঘটনাচক্রে বিঘূর্ণিত হইয়া তাঁহাকে "মেট্রপলিটান্" বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হয়। ১২৭৬ সালে বা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ট্রেনিং স্কুলের লুপ্তস্মৃতি বুকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কীর্ত্তিমঠ "মেট্রপলিটান্" বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তিনি সর্ব্বতোভাবে স্বীয় আত্মশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমতঃ এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাতে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ চরিত্রবান্ এবং সুশিক্ষিত হয় তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। সেকালে যাঁহারা ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি "মেট্রপলিটান্" বিদ্যালয়ে তাহাদিগকেই শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আনন্দের সহিত যাহাতে ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করে সেদিকে তিনি সতত দৃষ্টি রাখিতেন—শিক্ষকগণ কোন ছাত্রের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ কিংবা বেত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

তিনি ছাত্রদের, শিক্ষকগণের এবং সমুদয় কর্ম্মচারীর

প্রতি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করিতেন। স্বচক্ষে প্রত্যহ বিদ্যালয় দর্শন করিতেন, আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিত না। স্কুল পরিদর্শনে তাঁহার কোনও নির্দ্ধারিত সময় ছিল না, কাজেই শিক্ষকগণ সতত সতর্ক থাকিতেন। তাঁহার চেষ্টা যত্ন ও অধ্যবসায় প্রভাবে মেট্রপলিটান্ বিদ্যালয় সেকালে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার লাভ করিয়াছিল। ইহা এখন "বিদ্যাসাগর কলেজ" নামে অভিহিত।

তাঁহার চরিত্রের তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা বাঙ্গালী চরিত্রের আদর্শ হওয়া উচিত। তিনি উচ্চনীচ সকলের সহিতই নির্ভীকভাবে ব্যবহার করিতেন। কোনরূপ অপমান সহ্য করিতে পারিতেন না। এখানে দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন সংস্কৃত কলেজে কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে একদিন হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপাল্ কার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। সাহেব সে সময় টেবিলের উপর পা তুলিয়া বসিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেও তিনি তদবস্থায় রহিয়াই কথোপকথন করেন, কিন্তু সে দিবস সাহেবের এইরূপ অভদ্রতা দেখিয়াও কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে কোন প্রয়োজন-বশতঃ কার সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ

করিতে তাঁহার বাটীতে গমন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা ভুলিয়া যান নাই, তিনিও পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া আপনার চটিজুতাশোভিত চরণযুগল টেবিলের উপর তুলিয়া দিলেন, সাহেবকে বসিতেও অনুরোধ করিলেন না। সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত অপমানিত বোধে শিক্ষাসমাজের তদানীন্তন সম্পাদক ময়েট সাহেবকে সমুদয় কথা বিবৃত করিলেন। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কৈফিয়তে কার সাহেবের দুর্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিলেন। ফলে, ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এইরূপ তেজস্বিতা দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন এবং কার সাহেবকে শিষ্ট ব্যবহারের জন্য উপদেশ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরে ময়েট সাহেব আর কোনদিন এ বিষয়ের উল্লেখ করেন নাই।

"ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল। তিনি সর্ব্বত্র থানের ধুতি, মোটা চাদর ও চটিজুতা পায়ে যাতায়াত করিতেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সজ্জা করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল দুই একদিন চোগা চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর

সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে সাহেব তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্ত বেশে আসিতে অনুমতি দিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃমাতৃভক্তির তুলনা ভাষায় প্রকাশ করা চলে না। পৃথিবীতে তিনি পিতামাতার চরণ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম মানিতেন না। পিতা ও মাতার চরণদর্শনের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার কাশীধামে গমন করেন, সেখানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া অকপটভাবে তাহাদিগকে বলিলেন—"এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।"

তদুত্তরে কাশীর ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "আপনি কি তবে কাশীর বিশ্বেশ্বর মানেন না?" ইহা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।" ইহা শুনিয়া, ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন, "তবে আপনি কি মানেন?" তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর করিলেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননী দেবী বিরাজমান।"

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় চিরদিনই অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার নিজের পাঠাগারে প্রায় লক্ষাধিক টাকার পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। পুস্তকালয়টীকে তিনি জীবনালম্বন বলিয়া বিবেচনা করিতেন। অবসর সময়ে সর্ব্বদা গ্রন্থ অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি পুস্তক ব্যতীত থাকিতে পারিতেন না। বিলাত হইতে বহু অর্থব্যয়ে তাঁহার পাঠাগারের পুস্তকসমূহ বাঁধাইয়া আনিয়াছিলেন। অতি প্রিয়জনকেও তিনি তাঁহার লাইব্রেরীর কোন পুস্তক প্রদান করিতেন না। এমন কি, একবার তাঁহার স্নেহের পাত্র স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক চাহেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে লাইব্রেরীর পুস্তক না দিয়া নূতন পুস্তক কিনিয়া দেন। একবার তাঁহার একটি ধনাঢ্য বন্ধু লাইব্রেরীর বাঁধান পুস্তক দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি পাগল। এত টাকা খরচ করিয়া বিলাত হইতে এসব পুস্তক বাঁধাইয়া আনিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি?" বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার উত্তরে বলেন—"এক গাছি দড়ি দিয়া আপনি ঘড়িটি বাঁধিয়া রাখিতে পারেন, তবে এত টাকার সোণার চেইনের প্রয়োজন কি? কম্বল গায় দিতে পারেন, শাল গায়ে দিয়াছেন কেন? আপনিও ত পাগল।"

বিদ্যাসাগর

আদর্শ পুত্র, আদর্শ পিতা, আদর্শ দানশীল মহাত্মা এই যুগে তাঁহার ন্যায় আর কে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? দীন দরিদ্রের সেবায়, পরের অভাব-ক্লেশ-মোচনে—আর্ত্তের ক্রন্দনে ব্যথিত ও বিচলিত আর কাহাকেও ত বিগলিত তুষারের ন্যায় অজস্র স্নেহধারা ঢালিয়া দিতে দেখা যায় নাই? লোক-শিক্ষায় অবিচল, স্ত্রীশিক্ষায় যত্নশীল, বিদ্যাদানে মুক্তপ্রাণ, আত্মসম্মানে সুদৃঢ়চিত্ত, কর্ম্মবীর এমন পুরুষসিংহের তুলনা কোথায়? পরোপকারে অকৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্বে বিশ্বাসঘাতকতা এমন কয়জনে সহিয়াছেন?

যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও তেমনি এই অধঃপতিত দেশে জন্ম হইয়াছিল।

তারপর কর্ম্মশেষে দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল মেট্রপলিটান্ স্কুল ও কলেজটিকে প্রতিপালন করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জ্জনা করিয়া, বন্ধু-বান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল ও বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙ্গালী জাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রিতে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ।